চারি দিকে দেখো চাহি হৃদয় প্রসারি,
ক্ষুদ্র দুঃখ সব তুচ্ছ মানি
প্রেম ভরিয়া লহো শূন্য জীবনে।

(পৃ. ১০৭)

উপনিষদের মতানুসারে বিশ্বচেতনা বা ঈশ্বরচেতনায় সমৃদ্ধ হওয়ার উপায় রয়েছে আত্মবোধে।[৫] রবীন্দ্রনাথ এভাবে এই কথাটির ব্যাখ্যা করেন। মানুষকে আত্মবোধের প্রয়োজনে তার ব্যক্তিসত্তা ও আত্মার পার্থক্য উপলব্ধি করতে হবে। আপন আত্মাকে নিজের আমিত্ব বা ব্যক্তিসত্তার ঘেরাটোপের বাইরে উপলব্ধি করা হচ্ছে পরম মুক্তিলাভের প্রথম সোপান। তবে এ বিষয়ে আমাদের নিশ্চিত হতে হবে যে আমরা মূলত ঐশী সত্তা। ব্যক্তিসত্তাকে অতিক্রম করার পথ হচ্ছে অহমিকা, লালসা ও ভীতিকে জয় করা। আর এ কথাও জানা প্রয়োজন যে জাগতিক ক্ষতি বা শারীরিক মৃত্যু আত্মার সামান্যতম ক্ষতিও করতে পারে না।

মানুষকে পাখির সঙ্গে তুলনা করে সংস্কৃত ভাষায় পাখিকেও দ্বিজ আখ্যা দেওয়া হয়। এই আখ্যা কেন দেওয়া হয় তার ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় অধ্যায়ে করেছেন। পক্ষীশাবক অণ্ডজ কিন্তু একবার সে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হলে তখন তার এই বোধ জন্মায় যে এতদিন যে কঠিন আস্তরণের মধ্যে তার বাস ছিল তা আসলে তার জীবনের কোনো অংশ নয়। আলো-বাতাসের মধ্যে মুক্তিলাভ করতে তার গোলাকার বহিরাবরণটিকে কঠিন আঘাতে চূর্ণ করে তার পক্ষীজন্মের উদ্দেশ্য সার্থক হয়। মানুষের দ্বিজত্ব প্রাপ্তি হয় তখন যখন সে আত্মসংযমের অনুশাসন ও উচ্চচিন্তা চর্চায় দ্বাদশবর্ষ অতিবাহিত করে। এর পরবর্তীকালে তার কামনা বাসনা হয়ে ওঠে অত্যন্ত সাধারণ, সে অন্তরে শুদ্ধ হয়ে জীবনের সকল দায়িত্ব নিঃস্বার্থভাবে পালন করতে প্রস্তুত হয়— এখানেই তার সত্তার মহত্ত্ব। মানুষ তার দ্বিতীয় জন্মলাভে যখন তার অহংবোধের খোলস ত্যাগ করে বেরিয়ে এসে তার পরিমণ্ডলের সঙ্গে এক সজীব ক্রিয়াশীল সম্পর্ক স্থাপন করে তখন সমগ্রের সঙ্গে সে এক হয়। মানুষের আত্মবোধের পর্যালোচনা এভাবে করা যেতে পারে।

Scanned with CamScanner

প্রাচীন ভারতে যাঁরা শিক্ষাগুরু ছিলেন তাঁদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কখনোই এমন ধারণা করেননি যে তাঁরা নেতিবাচক ভাবে অহং এবং পার্থিব জগৎকে ত্যাগ করার উপদেশ দিয়েছেন। তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে ত্যাগের পথে পরিচালিত করে তার আত্মবোধ জাগ্রত করা যাতে সে বিশ্বকে একটি পূর্ণ সত্য রূপে লাভ করে। এই কথাগুলির সমর্থন যিশুখ্রিস্টের বাণীতেও পাওয়া যায়। তিনি বলেন সহিষ্ণু মানুষমাত্রই আশীর্বাদধন্য, তারাই পৃথিবীতে চিরস্মরণীয় হয়। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস অহং-মুক্ত মানুষের আত্মবোধ জাগ্রত হলে সে বিশ্বস্রষ্টার সঙ্গে পূর্ণ মিলন উপলব্ধি করবে।

সাধুসিংহকে বুদ্ধ যে ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন এখানে রবীন্দ্রনাথ সে প্রসঙ্গের অবতারণা করেন। বুদ্ধ বলেছিলেন তিনি তাঁর ধর্মানুশাসনে যে কর্মপরিত্যাগের কথা বলেন তা নেতিবাচক দিক থেকে নয়। যে কর্ম বাক্য, চিন্তা ও কাজকে কলুষিত করে তা পরিত্যাজ্য। যে কর্ম, বাক্য চিন্তা ও কাজে মঙ্গলের দিক নির্দেশ করে না সে কর্ম ত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয় কারণ তা চেতনাকে সম্প্রসারিত করে না। তিনি সাধুসিংহকে উদ্দেশ করে বলেন যে, ধর্মোপদেশে তিনি যে প্রশমনের বিষয় আলোচনা করেছেন তা গর্ব, লালসা, কুচিন্তা ও অজ্ঞতার প্রশমন, তা কখনোই ক্ষমা, প্রেম, দানশীলতা ও সত্যকে নিয়ন্ত্রিত করা নয়। শেষোক্ত গুণাবলি মানুষের চেতনার উত্তরণ ঘটাতে সাহায্য করে যার দ্বারা সে মুক্তিলাভ করে। বুদ্ধের এই ধর্মোপদেশের সঙ্গে প্রাচীন ভারতের শিক্ষাগুরুদের উদ্দেশ্যের মিল দেখা যায়।

রবীন্দ্রনাথ বলেন বুদ্ধ যে মুক্তির কথা বলেন তা অবিদ্যার দাসত্ব থেকে মুক্তি। অবিদ্যাজনিত কারণে যে অজ্ঞতা তা চেতনাকে আমিত্বে সীমিত করে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে। আমিত্বের সীমারেখা যে পার্থক্যের সৃষ্টি করে তা অহংবোধের সূচনা করে। এ থেকেই উদ্ভূত হয় আমাদের অহমিকা, লোভ, নৃশংসতা যা আত্মপরায়ণতার অনুষঙ্গ।[৫] মানুষ অবিদ্যার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে তার ব্যক্তিগত অস্তিত্বের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকে। যেমন নিদ্রিত মানুষ তার পার্থিব জীবনের সংকীর্ণ পরিসরে আবদ্ধ থাকায় জীবিত অবস্থায়ও তার নিজস্ব পরিমণ্ডল সম্বন্ধে অচেতন। তার নিজের অস্তিত্বও তার অজানা। অবিদ্যা বা অজ্ঞতা যে অহংবোধের জন্ম দেয় তা কঠিন বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে যা থেকে তৈরি হয় অহংকার লোলুপতা

Scanned with CamScanner

ও নির্দয়তা। এ সবই মানুষের আত্মপরায়ণতার অনুষঙ্গ। তাই মানুষ অবিদ্যা থেকে মুক্তিলাভ করতে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানায়—

তোমার প্রেমের অরূপ মূর্তি দেখাও ভুবনতলে।
সবার সাথে মিলাও আমায়, ভুলাও অহঙ্কার,
খুলাও রুদ্ধদ্বার
পূর্ণ করো প্রণতিগৌরবে।।

(পৃ. ১১৭)

বিচ্ছিন্ন অবস্থায় মানুষ বেঁচে থাকতে পারে ঠিকই কিন্তু পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে তার বৈচিত্র্যপূর্ণ সম্পর্কগুলি সবই রয়ে যায় অজানা তাই সে নিজেকেও জানে না। আর সেই না জানা তাকে ঈশ্বরকেও জানতে দেয় না। রবীন্দ্রদর্শনে মানুষ অন্য মানুষ এবং প্রকৃতিকে জেনে মুক্তিলাভ করে; মুক্তিলাভেই হয় তার আত্মবোধ। রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর বা ভগবান তো বিশ্বের সব-কিছুতেই অভিব্যক্ত, তাই পারিপার্শ্বিক অজানা থাকলে ঈশ্বরকেই বা কীভাবে জানা যায়? আর এ-সবের কারণই হচ্ছে অবিদ্যা। অবিদ্যায় আচ্ছন্ন মানুষ তার আমিত্বের বেড়াজালে বন্দি হয়ে পড়ে, যে 'আমি' হচ্ছে তার 'ছোটো আমি'। এ অবস্থা তার আধ্যাত্মিক নিদ্রা যখন সে তার পরিমণ্ডল সম্বন্ধে পূর্ণমাত্রায় অচেতন এবং আপন আত্মার সম্বন্ধে প্রকৃত সত্যও থেকে যায় অজানা। এই নিদ্রার ঘোর কাটিয়ে সে যখন চেতনার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছোয় তখন সে তার 'বোধি' অর্জন করে। তার অস্মিতাবোধ থেকে মুক্তিলাভ করে সে হয়ে ওঠে 'বুদ্ধ'।

এই আলোচনা থেকে রবীন্দ্রনাথ চলে যান বাউলতত্ত্বে। এবং এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করেন যা তিনি তাঁর 'শান্তিনিকেতন' উপদেশাবলির "আত্মবোধ" প্রবন্ধটিতেও (র-র ১২, পৃ. ৩৯৩) বলেছেন। তিনি কোনো এক সময় বাউল সম্প্রদায়ের দু'জনের কাছে তাঁদের ধর্মের বিশেষত্ব সম্বন্ধে জানতে চান। একজনের কাছে বিষয়টি জটিল মনে হওয়ায় তিনি উত্তর দিতে চান না। অপরজন বলেন যে উত্তর ঠিকই দেওয়া যায় কারণ কথাটা সহজ। '.....আমরা বলি এই যে, গুরুর উপদেশে গোড়ায় আপনাকে জানতে হয়। যখন আপনাকে জানি তখন সেই আপনার মধ্যে তাঁকে পাওয়া যায়।' পরমাত্মাকে পাবার জন্য

Scanned with CamScanner

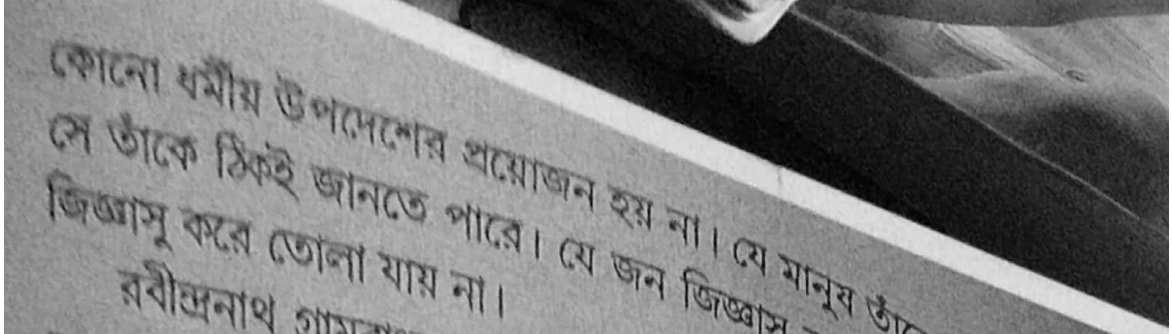

কোনো ধর্মীয় উপদেশের প্রয়োজন হয় না। যে মানুষ তাঁকে জানতে তৃষিত হয় সে তাঁকে ঠিকই জানতে পারে। যে জন জিজ্ঞাসু নয় তাকে ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে জিজ্ঞাসু করে তোলা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ গ্রামবাংলার এই ব্রাত্য তপস্বীর কথা আপনার অন্তরেও অনুভব করেছেন। উপনিষদের বক্তব্যও ধর্মোপদেশের মাধ্যমে শেখানো যায় না। "আত্মবোধ" প্রবন্ধতেই তিনি বলেছেন যখন মানুষ নিজের অন্নবস্ত্র সংস্থানের বাইরে গিয়েও আরও কিছু খোঁজে, সে তখন নিজেকে খোঁজে। 'মানুষ অন্নবস্ত্রের চেয়ে গভীর প্রয়োজনের জন্যে পথে বেরিয়ে পড়েছে। কী সেই প্রয়োজন? তপোবনে ভারতবর্ষের ঋষি তার উত্তর দিয়েছেন, এবং বাংলাদেশের পল্লিগ্রামে বাউলও তার উত্তর দিচ্ছে। মানুষ আপনাকে পাবার জন্য বেরিয়েছে— আপনাকে না পেলে, তার আপনার চেয়ে যিনি বড়ো আপন তাঁকে পাবার জো নেই।' (পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৪)। মানুষের ইতিহাস তার আত্মবোধের জন্য যে যাত্রা তার ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় তাই মানুষ তার অমর আত্মাকে নানাভাবে জানার উদ্দেশ্যে নিজেকে একভাবে প্রস্তুত করে, আবার নতুনভাবে আত্মাকে জানতে নিজের হাতেই সে প্রস্তুতি নষ্ট করে নতুন প্রস্তুতি নেয়। যে আত্মাকে সে জানে তা মৃত্যুঞ্জয় এবং তাকে জানার পথে মানুষের জীবনে যে প্রমাদ বা ব্যর্থতা আসে তা কখনোই তুচ্ছ নয়। অচরিতার্থতা তার কাছে গ্লানিকর নয়। যে চরম সার্থকতা সে লাভ করতে চায় তার সকল আয়োজনের মাঝে অসাফল্য বা অকৃতকার্যতারও ভূমিকা আছে।

আমার সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটবে ফুল ফুটবে।
আমার সকল ব্যথা রঙিন হয়ে গোলাপ হয়ে উঠবে।

(পৃ. ১২৩)

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন মানুষের কাছে তার নিষ্ফলতার পীড়ন বা যন্ত্রণা অসহনীয় হয়ে উঠত যদি না তার অন্তরের গভীরে সে নিবিড়ভাবে আত্মাকে লাভ করার আনন্দ উপভোগ করত। এই আনন্দ তার ঐশ্বরিক শক্তির পরীক্ষা করতে দুঃখ দুর্দশা সহ্য করে ত্যাগের পথে অমূল্য সম্পদের প্রমাণ পেয়েছে। তাই মানুষের কণ্ঠে শুনি —

দুখের বেশে এসেছ ব'লে তোমারে নাহি ডরিব হে।
যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা নিবিড় ক'রে ধরিব হে।।

(পৃ. ১২৩)

Scanned with CamScanner